The Chittagong University Journal of Social Sciences Vol. 34, 2024 (P. 275-288)

মান্দাই জনগোষ্ঠীর আত্মবিলোপনের আখ্যান: প্রসঙ্গ বনপাংশুল

শাকিলা তাসমিন[১]

সারাংশ

সেলিম আল দীনের রচিত নাটক বনপাংশুল (১৯৯৭) তাঁর নাট্য রচনার বিষয়-বৈচিত্র ও আঙ্গিকগতভাবে ভিন্ন ধারার রচনা রূপে বিবেচ্য। সেলিম আল দীন মূলত ময়মনসিংহ জেলার সখীপুর অঞ্চলের বিলুপ্ত মান্দাই জনগোষ্ঠীর জীবনাচারকে কেন্দ্র করে রচনা করেছেন বনপাংশুল। এই জনগোষ্ঠী মূলত বৃক্ষপূজারী, তাদের নানা সংস্কার ও উপাচারের কারণে এই সম্প্রদায় গজারি বন বিনষ্ট না করার ব্রত পালনে বদ্ধ পরিকর। এই মান্দাই জনগোষ্ঠী নিতান্তই নিরীহ, ধর্মবিশ্বাসী ও শিবের পূজারী। পাহাড়ী গভীর জঙ্গলে তাদের বসবাস ও নিত্যকার জীবনযাপনের সকল অনুষঙ্গ এই বনভূমি থেকেই আহরিত। মূলত এই মান্দাই সম্প্রদায় টাঙ্গাইল জেলার সখীপুর অঞ্চলের বিচ্ছিন্নভাবে বসবাসকারী বিলুপ্তপ্রায় জনগোষ্ঠী। এই নাট্যে মান্দাই গোষ্ঠী মধুপুর ও ভাওয়াল গড় অঞ্চলের গভীর অরণ্যে নানা প্রতিকূল প্রতিবেশকে উপেক্ষা করে বসবাসের উপযোগী করে তোলে।মান্দাই সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন কোন পরিবার যথেষ্ট সচ্ছলতার সঙ্গে জীবন অতিবাহিত করতো,পরবর্তীতে বাঙালির আগ্রাসী মনোভাব এবং জমি জবর দখল প্রক্রিয়ার কারণে এদের জীবনযাত্রায় নেতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হতে থাকে। আলোচ্য প্রবন্ধে মান্দাই সম্প্রদায়ের ধর্ম, সংস্কৃতি, নিত্যকার জীবন নির্বাহসহ প্রতিনিয়ত বাঙালি জোতদারদের সঙ্গে লড়াই করে স্বভূমি আঁকড়ে থাকার প্রবল স্পৃহা এবং হৃদয়ের তীব্র বেদনা ও আত্মবিলাপের করুণচিত্র বিবৃত হয়েছে।

১. গবেষণা পদ্ধতি

যে কোনো গবেষণার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হলো গবেষণাটি সমৃদ্ধ করবার জন্য উল্লেখিত গবেষণার বিষয় অনুসারে তথ্য সংগ্রহ করা। আলোচ্য প্রবন্ধটিতে তথ্য সংগ্রহের জন্য বিশ্লেষণী পদ্ধতি এবং এবং আলোচ্য প্রবন্ধের সাথে সম্পর্কিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধের সহায়তা গৃহীত হয়েছে। গবেষণা কর্মটি যেহেতু নাট্যকারের একক নাটককে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে তাই মূল পাণ্ডুলিপি পাঠ/বিশ্লেষণ এই পদ্ধতির মূল আধার। নাটকটির মৌল উপজীব্য সমাজ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। বক্ষ্যমাণ গবেষণায় নাটকের টেক্সট বা পাণ্ডুলিপি থেকে সংগ্রহ করে গবেষণায় বর্ণনামূলক ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির সম্মিলিত প্রয়োগ পরিলক্ষিত হবে। এমনকি প্রত্যেক চরিত্রের অর্ন্তগত মানসিক ও মানবিক বিষয়টি নাটকের সর্বত্র মূল বিষয় রূপেই পরিগণ্য হয়েছে।

২. বনপাংশুল নাটকের প্রেক্ষাপট

বনপাংশুল[২] নাটকটি রচনার প্রাক্কালে লেখক সরেজমিনে উক্ত মান্দাই ভূমি প্রত্যক্ষণ, তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের মাধ্যমে তাঁর রচনাটি সম্পন্ন করতে সমর্থ হয়েছেন। এ সময়ে তিনি

---

[1] সহযোগী অধ্যাপক, নাট্যকলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ। ই-মেইল: Shakilatasmin@gmail.com

মান্দাই গোষ্ঠীর ধর্ম, আচার, রীতিনীতি, বিশ্বাস, পূজা, বাৎসরিক উৎসব, কৃত্য, বিভিন্ন লোককথা, বিশ্বাস, পুরাণ, খাদ্যাভ্যাস, নৃ-তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। তাঁর দীর্ঘদিনের পথপরিক্রমায় উঠে এসেছে মান্দাই সম্প্রদায়ের জীবনাচারভিত্তিক নাটক বনপাংশুল। এই নাট্যে বিপন্ন প্রায় মান্দাই জাতির বাস্তব জীবনের প্রতিচ্ছবি বিধৃত হয়েছে। যারা প্রতিনিয়ত নির্যাতনের শিকার বাঙালি সম্প্রদায় দ্বারা এমনকি তাদেও ঘরবাড়ি আগুনে পুড়িয়ে দিতে থাকে উচ্ছেদের ষড়যন্ত্রে। তরপরও এই সম্প্রদায় পূণরায় বেঁচে থাকার নতুন উদ্যমে বসতি পুনঃস্থাপন করতে তৎপর হয়। বনপাংশুল নাটকটি রচনার আদ্যপান্তে রয়েছে নাট্যকারের মান্দাই জনগোষ্টীর সঙ্গে সুগভীর আত্মিক সংযোগ। তিনি নাটক রচনার ক্ষেত্রে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ ও প্রত্যক্ষণ করছেন তাদের সামগ্রিক জীবনাচার। এ বিষয়ে গবেষক ড. লুৎফর রহমান বলেনঃ“অনিল বর্মণ (এমএ), তাঁর স্ত্রী, রাজেন্দ্র, শান্তি, পঞ্চমান্দাই, তাঁর স্ত্রী, দেবু মান্দাই, অমূল্য, সুদীন, বিমলা, নিধিরাম (নিধি মান্দাই), সুবল ফুলমতি,গোপাল,প্রমূখ মান্দাইদের সঙ্গে তিনি প্রত্যক্ষ আলাপচারিতায় অংশগ্রহণ করেন। তাদের বাস্তুশিল্প, গার্হস্থ্যধর্ম, সমাজসংগঠন ও তার বিধিবিধান সম্পর্কে অজ্ঞাত তথ্য সংগ্রহ করেন সেলিম আল দীন। পর্যায়ক্রমিক তিন বছর বিভিন্ন সময়ে উল্লেখিত অঞ্চলে বিভিন্ন ঋতুতে ভ্রমণের মাধ্যমে সম্পন্ন হয় তাঁর প্রত্যক্ষণ ও উপাত্ত সংগ্রহ” (রহমান, ২০০৯, পৃ. ১৫০)।

বনপাংশুল নাটকের কাহিনিতে দুই শ্রেণীর চরিত্রের উপস্থিতি লক্ষ্যণীয়। প্রথমত মান্দাই চরিত্র। দ্বিতীয়ত বাঙালি ঘরানার চরিত্রের অবস্থিতি। বাঙ্গালি চরিত্রসমূহের মধ্যে রয়েছে লুৎফর মাস্টার,ফরেষ্টার হাসান, গার্ড আজিমদ্দিসহ অজস্র বাঙালি চরিত্র। অন্যদিকে মান্দাই চরিত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সুকি, অনিল, গুণীন[৩], রাজেন্দ্র, কমলা, নৃপেন, মঙ্গলি, মালতি, সোনামুখী, মেঘলালসহ মান্দাই সম্প্রদায়। বনপাংশুল নাটকটিতে তিনটি খণ্ডে কাহিনি বিস্তার লাভ করেছে। যার মাধ্যমে বাংলা পাঁচালির[৪] যে বৈশিষ্ট্য তা নাটকের শেষাবধি দৃষ্ট হয়, যেমন নাটকের শুরুতে বন প্রবেশ-১ ‘কথা’ প্রযুক্ত হয়েছে। এভাবে সমগ্র নাটকে কথা, পদ, বোলাম, নাচাড়ি, দিশা নাটগীত, তত বোলাম, শিকলি ইত্যাদি দেখা যায়। এথেকে বোঝা যায় মধ্যযুগীয় পাঁচালির আঙ্গিক দ্বারা বনপাংশুল নাট্য কাহিনি নিষ্পাদ্য হয়েছে। এ বিষয়ে সেলিন আল দীন বলেন: বনপাংশুল

---

[২]**বনপাংশুল:** বন বলতে সাধারনত বিস্তৃত ঘন অরণ্যকে বোঝানো হয়। অন্যদিকে পাংশুল অর্থ যারা বনে বাস করে অর্থাৎ গভীর অরণ্য বা বনে বসবাসরত জনগোষ্ঠীই **‘বনপাংশুল’** নামে পরিচিত।

[৩]**গুণিন:** এটি নাট্যে উল্লেখিত একটি চরিত্রের নাম। এই গুণিন শব্দটিতে নিহিত আছে তন্ত্রমন্ত্রের বিষয়। গুণিন মূলত ঝাড়-ফুঁকের মাধ্যমে গাছ-গাছালীর শেকড়-বাকড় দিয়ে চিকিৎসা প্রদান করে থাকে কিংবা নানা দেব- দেবীর আরাধনা করে থাকে।

৩ **পাঁচালি:** মধ্যযুগের প্রচলিত একটি পরিবেশনা রীতি। এতে গান, নাচ, অভিনয়, কথা, সংলাপ এর সন্নিবেশ থাকে।

বাংলা পাঁচালির আঙ্গিকগত অনুপ্রেরণায় রচিত উপাখ্যানবর্তী নাট্য (দীন, ২০১০, পৃ. ৬০১)। বিশেষজ্ঞদের মতে বনপাংশুল একটি জনগোষ্ঠীর ভৌগলিক নৃতাত্ত্বিক-আর্থ সামাজিক ধর্ম-পূজা-আচার-বিশ্বাস-বস্ত্রালঙ্কার-আহার ইত্যকার সকল বিষয়ের একটি পরিপূর্ণ আখ্যান।

বনপাংশুল নাটকের সর্বত্র বিবৃত হয়েছে অসংখ্য চরিত্রের জীবনবোধ শুধু তা নয় প্রত্যেকটি চরিত্রের মধ্য দিয়ে বপিত হয়েছে একেকটি পরিবারের আনন্দ-বেদনা-হাহাকারের চিত্র,যার মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের বিচিত্র এবং জীবনবোধের করুণ চিত্র বিবৃত হয়েছে মহাকাব্যের আদলে। এ বিষয়ে গবেষক ড.লুৎফর রহমান বলেনঃ বনপাংশুল নাটকের কাহিনী প্রচলিত নিয়মে মহাকাব্যিক বিস্তার লাভ করেছে-সংস্কৃত নন্দনশাস্ত্রে বিধান অনুযায়ী অন্তত তা বলা যায়। একটি জাতি বা গোষ্ঠীর উত্থানপতন তথা সংগ্রাম ও সিদ্ধির ইতিবৃত্ত মহাকাব্যে আত্মপ্রকাশ করে (রহমান, ২০০৯, পৃ. ১৫৯)।

সেলিম আল দীনকৃত বনপাংশুল নাটকে বাঙালি মহাজনদের ভূমি দখল কূটকৌশলের প্রভাব নাট্যধৃত চরিত্র সমূহের মধ্যে প্রবলভাবে প্রভাব বিস্তার করে। যার ফলাফল চরিত্র সমূহকে ভয়াবহ পরিণতির দিকে ধাবিত করে। মূলত সামন্ত শ্রেণীর অত্যাচার, নির্যাতন, নিপীড়ন, ভয়ভীতি প্রদর্শন, ভিটাবাড়ী থেকে উচ্ছেদ মান্দাই জনগোষ্ঠীর যাপিত জীবনকে যন্ত্রনাক্লিষ্ট করে তোলে। যার ফলশ্রুতিতে মান্দাই[৫] বাঙালি সংঘাত, হামলা, মামলা মান্দাইদের নিশ্চিহ্ন করে। এই বিষয়ে গবেষক অরুণ সেন বলেন: এই সমস্ত নানা স্তরের মানবিক সম্বন্ধের পেছনেই আছে অরণ্যের বাস্তব। বাঙালি মহাজনেরা ফরেস্টারের সঙ্গে শলা-পরামর্শে বসে, কীভবে মান্দারদের উৎখাত করতে হবে (সেন, ২০০০, পৃ. ৭৭)। বনপাংশুল নাট্য কাহিনিতে যে বিষয়সমূহ আবর্তিত হয়েছে তা হলো:

১) বাল্য বিধবা সুকির শিবের কুচুনি হবার কারণে পিঁপড়ার কামড় স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে আত্মশুদ্ধির প্রচেষ্টা করা।

২) অভাবের তাড়নায় নৃপেনের ভিটা বাড়ি বিক্রি ও আত্মহত্যা।

৩) গোপনে রাজেন্দ্রের ভিটা বাড়ী বিক্রি এবং কোচ রাজার ভিটা খনন করে গুপ্তধন পাওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করার কারণে তাকে পুলিশি হেফাজতে কারাবরণ ও ভিটা থেকে উচ্ছেদ।

৪) পশুপতির হিন্দুধর্ম গ্রহণ।

৫) মঙ্গলির অভাবের তাড়নায় দেহ ব্যবসা।

[৫]**মান্দাই:** এটি একটি জনগোষ্ঠীর পরিচয় বহন করে। এদের বলা হয় আদিবাসী। এদের বসবাস বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে দেখা যায় যেমন গাজীপুর, মধুপুর টঙ্গাইল, ময়মনসিংহের ভালুকা, ঠাকুরগাঁও প্রভৃতি ।

৬) সুকি ও অনিল কোচের প্রেম ধর্মীয় কুসংস্কারের কারণে বিভ্রান্তির দিকে ধাবিত হয়।

৭) বাঙালি কর্তৃক মান্দাই জনগোষ্ঠীর ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেয়া, ভিটাবাড়ী দখল।

৮) সর্বপ্রাণবাদী গুণীনের মৃত্যুভীতি গজারি বৃক্ষের কাছে মুক্তি প্রার্থনা ও মৃত্যু।

৯) গুণীনের মৃত্যুর পর পুনরায় বাঙালিদের দ্বারা মান্দাই সম্প্রদায়ের উপর আক্রমণ, অত্যাচার, অগ্নিসংযোগ ও নারী ধর্ষণ।

১০) অনিল কতৃক ধর্ষিত সুকির অনাগত মানবভ্রুণ সমেত সুকিকে গ্রহণ করা।

১১) বাঙালির অত্যাচারের ফলে আগুনে দগ্ধ সোনামুখীকে লুৎফর মাস্টারের স্ত্রীরূপে গ্রহণ।

'বনপাংশুল নাটকের কাহিনিতে দেখা যায় মান্দাই সম্প্রদায় ছায়া সুশীতল গজারি বনের বাঁকে বাঁকে গড়ে তুলেছে নিশ্চিত আবাস। কখনো ঝাঁঝালো রোদ কখনো অঝোর বৃষ্টি বা পৌষ-মাঘের তীব্র শীতের কাতরতা কখনো আবার মহুয়া ফুলের টুপটাপ ঝড়ে পড়া এবং সুতীব্র ঘ্রাণে মাতোয়ার গজারি বনের বাসিন্দারা ।মান্দাইগণ ঋতুচক্রের নানামাত্রিক পার্বণে সাধ ও সাধ্যের মধ্যে জীবন নির্বাহ ও বিভিন্ন পূজা-পার্বণ উদযাপনে নিরত থাকে। উদয় ও অস্তগামী সুর্যের সাথে তাদের জীবন চক্রকে গেঁথে ফেলে। প্রচণ্ড পরিশ্রমের পর নুন-ভাত যাই জোটে পরিতৃপ্তির ঢেকুর তোলে। নৃ-তাত্ত্বিকভাবে এরা কঠোর পরিশ্রমী-উদ্যমী, স্পর্শকাতর এবং সহজ-সরল জীবন যাপনে অভ্যস্ত। মান্দাই জনগোষ্ঠীর জীবন যাপন সম্পর্কে গবেষক ড. লুৎফর রহমান বলেন: বিশ্বাস সংস্কার, আত্মরক্ষার নিয়ত সংগ্রামের মধ্যে উল্লিখিত নৃগোষ্ঠীর পারস্পরিক সম্পর্ক, পারিবারিক ও গোষ্ঠীকেন্দ্রিক জীবনভাবনার বিচিত্র রূপ বিধৃত। অরণ্য ও অরণ্যচারী[৬] কোচগণ নাগরিক মানুষের সম্মুখে সামাজিক নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্টের অনেক জঙ্গমচিত্র রূপে মূর্ত (রহমান, ২০১২, পৃ. ২৮৬)।

৩. বনপাংশুল নাট্যে চরিত্রের আত্মক্ষরণের প্রতিধ্বনি

বনপাংশুল নাট্য কাহিনিতে বর্ণিত প্রত্যেকটি চরিত্র কোনো না কোনোভাবে জীবন-যন্ত্রণায় প্রতিনিয়ত দগ্ধ হচ্ছে। নাট্যে অন্যতম সুকি চরিত্রটি অবলোকন করলে দেখা যায় পিতৃ-মাতৃহীন সুকির বহমান জীবন ধর্মীয় রীতি কুসংস্কারের আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে। মাত্র পাঁচ বছর বয়সে ষাটোর্ধ বৃদ্ধের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ সুকি বিবাহ বাসরের পূর্বে অকাল বৈধব্য বরণে বাধ্য হয়। শুধু তা নয় মান্দাই সম্প্রদায়ের রীতি অনুযায়ী সুকিকে হতে হয় শিবের পত্নী। সুকি এই ধর্মীয় ও সামাজিক বিধিবিধান পালনে

[৬] **অরণ্যচারী:** অরণ্য অর্থ গভীর বনভূমিম। এই অরণ্যে বিচরণ কিংবা বসবাসকারীগণই অরণ্যচারী বলে বিবেচ্য।

অসম্মত তাই সে বলে: “পাঁচ বৎসর বয়সে অরে আম্রকাষ্ঠের পিঁড়িতে বসাইছে। তারপর একদিন সাবালকী হইলে তারে করলা শিবের কুচুনি। পুরাণ দিয়ে প্রাণ হরণ হুঁহ” (দীন, ২০১০, পৃ. ৩২০)। সুকি কৃত্য ও সংস্কারের বাইরে রক্ত মাংসের একজন নারী। পূর্ণ যৌবনা সুকি জৈবিক চাহিদা পুরণে অতৃপ্ত। পূর্ণযৌবনের আস্বাদ গ্রহণে সুকি-অনিল কোচকে উদাত্ত আহবান জানায় কোনো এক চৈতালী পূর্ণিমা রাতে। সুকির সুতীব্র চাওয়া প্রত্যাখ্যান করে অনিল কারণ তার হঠাৎ মনে হয় শিবের ভোগ্য যে নারী তাকে স্পর্শ রীতি বিবর্জিত এবং সনাতন ধর্মের আচার বহির্ভূত। তাইতো অনিল বারবার সুকিকে প্রেমালিঙ্গনের বাহুডোরে থেকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করে । কিন্তু সুকির উদাত্ত আহ্বান: আমার নাক ঘামতাছে কপাল ঘামে। অনিল দাদা আমারে ইচ্ছামতন আদর কর। হি হি। এই অনিল। অনিল (দীন, ২০১০, পৃ. ৪৩০)। মান্দাই সম্প্রদায়ের নারী সুকির এই হাসির আড়ালে আছে হৃদয়ের মর্ম যাতনা, যতই মান্দাইরা সুকির তৈরি বিশেষ মদের নেশায় বুঁদ থাকে হুশ হারায় মদের এমন মিষ্টতা স্বাদ ও ঘ্রাণে মাতোয়ারা হয়ে বাহবা জানায় তাতে সুকির হৃদয়ের আত্মক্ষরণ বন্ধ হয় না। প্রতিনিয়ত দগ্ধ সুকি মুক্তি চায় সনাতন ধর্মের অবরুদ্ধ শেকল হতে।

অন্যদিকে অভাবের তাড়নায় মান্দাই নারী মঙ্গলিকে হতে হয় বাঙালি মহাজনের প্রতিরাতের সঙ্গী। রাত শেষ হলে হাতে টাকা যা আসে সাওদা নিয়ে বাড়ি ফেরে মঙ্গলি। মা-বোনের মুখে দুমুঠো নুনভাতের জোগান দিতে থাকে। কিন্তু নিজে যখন ভাতের নলা মুখে দে তখন ডুকরে কান্না আসে ভাত গলায় আটকে যায়। প্রতিনিয়ত মনে হয় অপবিত্র এই জীবনের সমাপ্তি ঘটুক মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। বিবাহিত মঙ্গলির স্বামী নিরুদ্দেশ। পিতা বাঙালি জোতদারের হাতে খুন হয়। শরীরের অংশ মেলে পিতার কিন্তু মস্তক খুঁজে পাওয়া যায় না, হয়তো মঙ্গলি এখনো খুঁজে ফেরে পিতার দ্বিখন্ডিত মস্তক। এত কিছুর ভার নিয়ে মঙ্গলিকে দেহ ব্যবসায় নিযুক্ত হতে হয়েছে। সুকির নানা কটুক্তিতে মঙ্গলির বাঁধ ভাঙ্গা কান্না আর নিদারুণ আত্মগ্লানিতে বিদীর্ণ করা হাহাকার,মঙ্গলি বলে:আর কি: আর কি করতে পারতাম আমি মা বইনেরে বাঁচানোর নিগা। কি করতে পারতাম (দীন, ২০১০, পৃ. ৩৪৯)। তারপরও বহমান জীবনের প্রয়োজনে চৈত্রের শিমুল তুলার মত মঙ্গলি ধাবিত হয় সেই মহাজনের খাস কামরায়।

বাঙালি জোতদারদের অত্যাচার, নিপীড়ন মান্দাই সম্প্রদায়কে ভয়াবহ বিপর্যয়ের মুখে ধাবিত করে। তাদের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় মান্দাই অরণ্যের দিকে। যে কোনভাবে তারা বন উজাড় করে জমি দখলে তৎপর। তাদের যৌথ পরামর্শ, কূটচাল, প্রবল হুমকি প্রদর্শন সব কিছুই বন দখলের নিমিত্ত। সে প্রচেষ্টায় বাঙালি রাজু মহাজন, নূর মহাজন প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। রাজু মহাজনের জোর জুলুমে বসতভিটা হারিয়ে স্ত্রী-সন্তান নিয়ে দিকশূন্য হয়ে পড়ে নৃপেন। শুধুমাত্র মদের লোভ এবং রাজু মহাজনের জোর

জুলুমের কাছে পরাস্ত হয়ে নৃপেন ভিটা বাড়ী বিক্রি দিতে বাধ্য হয় । নৃপেনের স্ত্রী ও কন্যা মালতি গৃহহীন হয়ে পাগল প্রায়, অবিরল ক্রন্দনে ভারী হয়ে যায় বাড়ির চিরচেনা পরিবেশ কেবলই শূন্যতা বোধ করে মালতি। কোথায় গিয়ে মাথা গুজবে দুমুঠো আহারের যোগান হবে। এই ভাবনায় বিমর্ষ নৃপেনের স্ত্রী ও কন্যা। নৃপেনের স্ত্রী বলেঃ ক্যান বেচছ ভিটা ক্যান। ওই নেশার নিগা বিষের নিগা[৭] (দীন, ২০১০, পৃ. ৩৭২)।

নাট্যে ভিটে হারা নৃপেন প্রিয়জনের মুখ পানে তাকিয়ে বুঝতে পারে কি ঘোর অমঙ্গলের পথে পা বাড়িয়েছে সে। স্ত্রী-কন্যার সহজ-সরল মুখ যখন ভেসে ওঠে তখন ভাবে কোন অকূলে ভাসিয়েছে তাদের। এমন নানা প্রশ্নের উত্তর মেলাতে পারে না নৃপেন। প্রত্যহ সুর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে যেত নিত্যদিনের আহার সংগ্রহে, ঠিকই তো ফিরে আসতো আপন ভিটায়। এখন সে সহায় সম্বলহীন স্ত্রী সন্তানের কাছে অভিযুক্ত একজন মানুষ। এত্তোসব চিন্তার কোন সুরাহা করতে সম্ভবপর হয়নি নৃপেনের পক্ষে, তাই মদের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে আত্মহত্যা করে। এই বিষয়ে গবেষক শাহাদাৎ রুমন বলেন -আবার কোনো কোনো মান্দাই বাঙালি মহাজনের ফাঁদে পা দিয়ে বিদেশী মদও পান করে। পরে মহাজনের কূটকৌশলে দীর্ঘদিন ধরে মদ্যপান করে টাকা পরিশোধ নিমিত্তে ভিটাটুকু ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। নৃপেন মান্দাইও এই কৌশলে পা দিয়ে 'ছিয়াশি' বোতল মদের সঙ্গে কিছু বাড়তি টাকা পেয়ে ভিটা জমি থেকে উচ্ছেদ হয় (রুমন, ২০২৩, পৃ. ২০২)।

নৃপেনের মৃত্যুতে মান্দাইদের মধ্যে নেমে আসে শোকের মাতম। মান্দাই উৎসব পার্বণে যে নৃপেনের ঢোলের বাদ্য বাদনে নারী পুরুষের সমবেত দেহ নাচে গানে লাতিয়ে উঠেছে চাঁদনী রাতে গজারিবনের আলো-ছায়ায়। রাত যতই গভীর হতো নৃপেনের ঢোলের তীব্র সুর ধ্বণির বোল পৌঁছে যেত মান্দাই দেবতার ধামে। কখন যে ঢোলের তালে বোলে রাত গড়িয়ে ভোর হতো সেটা আঁচ পেত ভোরের লালিমা যখন মান্দাই নারী পুরুষের চোখ মুখ স্পর্শ করে যেতো তখন। নৃপেনের এই মৃত্যুতে তার স্ত্রী-কন্যা হতবিহ্বল। ভিটে গেছে তো গেছে, কিন্তু নৃপেন তো ফিরে আসবেনা। মা-মেয়ে যেন উচ্ছেদকৃত ভিটার এককোণে ভয়ার্ত চোখে তাঁকিয়ে রয়েছে, এক অজানা ভীতি ভর করেছে তাদের চোখে। এক অনিশ্চিত জীবনের পানে তাকিয়ে স্ত্রী বলছেঃ হে ভগবান । কোন দোষে বিধবা করলা আমারে (দীন, ২০১০, পৃ. ৩৭৬)। অন্যদিকে মালতি পিতার প্রতি তীব্র বেদনা আর প্রগাঢ় ভালবাসায় গগন বিদারী চিৎকার করে বলেঃ এই বন ছাইড়ে যাওনের আগে এই কথাটা শুনবার চাই। আমার বাবা সারা জনম শিবের গানের আসরে পূজায় পার্বণে ঢোল খোল

[৭]নিগাঃ এটি একটি আঞ্চলিক শব্দ। নিগা শব্দের অর্থ জন্য।

কাঁসর বাজায়ে অগ্‌ঘ[৮] নিবেদন করছে। সেই টুকুন পুণ্য কি আত্মঘাতা মানুষটারে সগগে[৯] নিব না (দীন, ২০১০, পৃ. ৩৮২)। মালতির এই আবেগঘন সংলাপে উপস্থিত সকলের চোখ ভিজে আসে কেউ ঢুকরে কেঁদে ওঠে, কেউবা হু হু করে কাঁদে।

শুধু নৃপেন বাঙালি জোতদারের ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে পরিবার পরিজনকে হুমকির দিকে ঠেলে দেয়নি। বাঙালিদের আগ্রাসী মনোভাবের ফলে রাজেন্দ্র চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক সঙ্কট প্রকট আকার ধারণ করে। বাঙালি মহাজন কর্তৃক রাজেন্দ্রর জমিজমা হাতিয়ে নিয়ে যাবার ফলে রাজেন্দ্র অপ্রকৃতস্থ হয়ে পড়ে এবং রাজেন্দ্র কোচ রাজার পরিত্যক্ত ভিটায় গুপ্ত ধনের সন্ধানে উন্মাদের মতো ভিটা খুঁড়তে থাকে। যন্ত্রণাক্লিষ্ট রাজেন্দ্র দেবতার কৃপা প্রার্থনা করে বারংবার যেন তার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়, সে যেন কোচ রাজার স্বর্ণ খনির নাগাল পেয়ে যায়। রাজেন্দ্র মাটি খুঁড়ে পেল লোহা লক্করের যন্ত্রপাতি,কিন্তু বাঙালি মহাজন জানায় রাজেন্দ্র গুপ্তধন পেয়েছে। মূলত মিথ্যে বলে নানা ফন্দি করে তাকে পাঠানো হলো হাজতে। ফলে রাজেন্দ্র মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে স্বাভাবিক চিন্তা ও কথা বলার শক্তি চিরতরে হারিয়ে ফেলে। বিষয়টি স্পষ্ট হয় লুৎফর মাস্টারের সংলাপে: রাজেন্দ্র হুঁশ হারা। ডাক্তার বলেছে তার মস্তিষ্কে রোগ হয়েছে। এ জনমে সারবে না (দীন, ২০১০, পৃ. ৪৩৮)।

রাজেন্দ্র ভিটা দখলে এতটায় মুষড়ে পড়েছিল তাই অপ্রকৃতস্থ হয়ে রাজার অমূল্য রতন প্রাপ্তির আশায় ভিটা খুঁড়তে থাকে। পরবর্তীতে মিথ্যা মামলায় জেল হাজত বাস তার স্মৃতি শক্তি বিনষ্ট করে ফেলে। যে রাজেন্দ্র বাঙালি জোতদারদের এই বনভূমি থেকে চিরতরে উচ্ছেদ করবার স্বপ্ন দেখেছিল, মান্দাইদের গানে-নাচে প্রতিটি সন্ধ্যা চাঁদ-তারার আলিঙ্গনে স্ত্রী ও তিন সন্তানকে নিয়ে বসত ভিটা আকঁড়ে থাকবার প্রবল স্পৃহা বুকে ধারণ করেছিল, সেই রাজেন্দ্র স্মৃতি বিভ্রমে হু হু করে কেঁদে উঠে। হয়ত অনুভব করছে এসব কিছু তার পক্ষে সম্ভবপর হবে না। বাঙালি জোতদার কর্তৃক গভীর রাতে পরিবার সমেত পাঠিয়ে দেয়া হয় অন্য বাঙালি জোতদারদের ভয়াল থাবার মুখে। সেদিন রাজেন্দ্রর স্ত্রী-সন্তানদের হৃদয় বিদীর্ণ করা হাহাকাণ্ডে মান্দাই অরণ্যে নেমেছিল ঘন মেঘের ছায়া, বুকে ধ্বণিত হচ্ছিল বিষাদের করুণ সুর। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মান্দাই বাঙালিদের মধ্যে শুরু হয় যুদ্ধের দামামা। সত্যিকার অর্থেই রাজেন্দ্র পরিবারসহ উচ্ছেদে মান্দাইদেও বিশাল গজারি বনে দেখা যায়: বনময় চিৎকার ছুটা ছুটি, এ বিষয়ে জানা যায় পাখিদের গান থেমে যায়। ভীতু খরগোশরা বনের আরও ভেতরে চলে যায় (দীন, ২০১০, পৃ. ৪৭২)।

---

[৮] এখানে অগ্‌ঘ - অর্ঘ্য অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্ঘ্য কোন কিছু পূর্ণতার উদ্দেশ্যে নিবেদন করাকে বোঝানো হয়। যেমন দেবতার উদ্দেশ্যে ফুল,ফল নিবেদন।

[৯] এটির শুদ্ধতম উচ্চারণ স্বর্গ। নাট্য চরিত্রটি তার মৃত পিতার যেন স্বর্গে স্থান পায় সে বিষয়টি বিবৃত করেছে।

বাঙালিদেও অত্যাচার নির্যাতনে নৃপেনের মৃত্যু এবং রাজেন্দ্রের পরিবারের গুম হয়ে যাওয়ায় মান্দাই দলপতি বৃদ্ধ গুণীন মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। নাটকে গুণীন মান্দাই সমাজের পুরোহিত। ধর্মীয় আচার বিধি, ধর্মীয় অনুশাসন প্রভৃতিতে তিনি যথাযোগ্য পুরোহিতের দায়িত্ব পালন করেন। যে কোন অমঙ্গল কামনায় তিনি গজারি বৃক্ষের আরাধনায় নিরত থাকেন। মান্দাই নারী পুরুষের মৃত্যু হলে তারা প্রাণ প্রথিত করেন বৃক্ষের মধ্যে। মান্দাইদের অন্ধ বিশ্বাস গুণীনের ধর্মীয় যে কোন আচার উপাচার ও কৃত্যমূলক আরাধনায় আরাধ্য দেবতার সাথে গুণীনের একটি আধ্যাত্মিক সংযোগ রয়েছে। মান্দাই কোন ব্যক্তির মৃত্যু হলে আত্মাটি বৃক্ষে প্রথিত করে এবং মান্দাইদের বিশ্বাস করাতে সচেষ্ট হয়েছে যে, বৃক্ষটি যতদিন বেঁচে থাকবে আত্মাটিও ততদিন বেঁচে থাকবে। তাই তো নৃপেন আত্মহত্যা করলে তার আত্মা বৃক্ষে প্রথিত করার কথা বলে গুণীন বলেঃ আত্মঘাতী নিরপেন ভূত হয় ধরাধামে থাকবো। গজারির মূলে বাকল হয়া পিটাপট করে চায়া থাকবো দুই জ্যান্ত চোখে (দীন, ২০১০, পৃ. ৩৮৩)।

মান্দাইবাসীর বিশ্বাস গুণীনের বদ্ধমূল ধারণা সঠিক। গুণীন এই বিষয়টি আয়ত্ত্ব করে সুদৃঢ় ও সুদূর পরিকল্পনায় নাতনি সুকি চরিত্রের মধ্যে একটি অলৌকিক ক্ষমতার প্রচার করেন এবং মান্দাইদের বিভিন্ন উৎসবাদিতে সুকি বিশেষ প্রক্রিয়ায় বিশেষ গাছের শেকড়ের মিশ্রণ ঘটিয়ে মদ তৈরী করে যা পানে সুকি শিবের আগমনী বার্তা মান্দাইদের জানান এবং শিব উক্ত স্থানে উপস্থিত হন বলে এই সম্প্রদায়ের বিশ্বাস। তাই গুণীন সুকিকে পরিচয় করিয়ে দেন শিবের কুচুনি[১০] বলে। কিন্তু সুকি শিবের কুচুনি হতে আগ্রহী নয়। সে অদৃশ্য কোন স্বামীর স্পর্শ অনুভব করতে রাজি নয়। সে রক্ত মাংসের মানুষ যে তাই অনিল কোচকে উদাত্ত আহবান জানায় প্রেমালিঙ্গনের। সুকি শিবকে পতি হিসাবে অস্বীকার করে বলেঃ না। আমিত শিবের ঘরণী না। আড়াল আবডালের পিরীতির নারী (দীন, ২০১০, পৃ. ৩১৭)। গুণীন মূলত তার মৃত্যুর পর মান্দাইদের কাছে সুকিকে তার উত্তরসূরি রূপে প্রতিষ্ঠিত করার অভিপ্রায়ে শিব-সুকির গল্পটির প্রচলন করে। কিন্তু নাট্যের কাহিনীর স্তরে স্তরে সুকির মন বাসনা সম্পর্কে ড. লুৎফর রহমান বলেন: আধুনিক নারীর মতো সে শারীরিক কামনা বাসনাকে প্রকৃত নিয়ম বলে মানে এবং তা নিবৃত করার তাগিদ অনুভব করে। অনিলের প্রতি তার ভালোবাসা প্রবল হলে সে কুচুনির অমর্যাদাকর জীবন থেকে বেরিয়ে আসতে চায়-অনিলকে শিব কৃষ্ণ বলে মানে (রহমান, ২০০৯, পৃ. ১৬৭)।

[১০]**শিবের কুচনি:** শিব হিন্দুদেবতা। নাট্যে শিবের সাথে অদৃশ্য বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় সুকি। তাই সুকিকে শিবের কুচুনি বা শিবের পত্নী রূপে আখ্যা দেয়া হয়েছে।

সুকি শেষাবধি বাঙালিদের ধর্ষণের শিকার হয়ে ভ্রুণ সমেত অনিল কোচের কাছে আশ্রয় লাভ করে। সুকির স্বপ্ন একটি সুখী গৃহকোণ। সেটি পূর্ণ হয়েছে তবে প্রবল মানসিক পীড়ন আর শারীরিক অত্যাচারের মধ্য দিয়ে। অনিল তাকে শেষাবধি স্ত্রী মর্যাদা দিতে বাধ্য হয়।

গুণীনের প্রায় আশি বছরের জীবন বোধের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কেবল দেখেছে জোর জুলুম, কলহ বিবাদ মান্দাই জনগোষ্ঠীর বারংবার দ্বিধা বিভক্তি, হিন্দু-মুসলিমদের মতানৈক্য প্রভৃতি। তবে 'গুণীন যতটাই সংস্কার আচ্ছন্ন হোক না কেন মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তিনি মৃত্যু নয় যাপিত জীবনের প্রতি তার অশেষ দূর্বলতা প্রকাশ করে। তাইতো শারীরিকভাবে যখন তিনি অসুস্থ বোধ করে তখন সুকিকে বলেনঃ না, হঠাৎ মনে হইল মরণ যদি ভর করে (দীন, ২০১০, পৃ. ৫০৯)।

মৃত্যুভয়ে কুপিত গুণীন হঠাৎ সুকির হাত ছেড়ে দিয়ে পালাতে শুরু করে। মান্দাইরা যতই তাকে থামতে বলে ততই সে দৌঁড়ে পালায় যেন মৃত্যদূত তার পিছু চলেছে। যে বাড়ী অতিক্রম করেছে সে বাড়ি থেকে তার প্রিয় খাবার চেয়ে খেয়েছে। এ যেন তৃপ্তিভরে জীবনের শেষ খাবার আস্বাদনে ব্যস্ত গুণীন। মৃত্যু ভয়ে কতটা ভীত হয়ে পড়েছিল তা নিম্নোক্ত বর্ণনায় ধৃত হয়ঃ মান্দাই গোত্রের সুখ দুঃখের অর্ধশত বৎসরের মন্ত্রসিদ্ধ পুরুষ। কে ধরবে তারে। সুকির বসানো দোলের দরার এক ভাণ্ড আবারও কলকল করে শুষে নেয় গুণীন। তারপর আবার নিজ ভিটা থেকে দক্ষিণমুখা ছুটে যায়। এক বাড়িতে গিয়ে চেঁচিয়ে বলেঃ তমাগওে হাঁড়িতে সইরষা ফুলের মধু নাই। সোনার বরণ দোলের চান্দের বরণ মধু (দীন, ২০১০, পৃ. ৫১১)। সত্যিই মান্দাই প্রধান পুরোহিত মধ্যরাতের নিকষ অন্ধকারে সকল মান্দাইদের দুঃখ অশ্রুজলে প্লাবিত করে চলে যায়। উক্ত সংলাপ থেকে তাই প্রতীয়মান হয়ঃ আইজ অস্তর পূইজা[১১] হব। সামনে মরণ বাঁচনের নারাই। হাতে সময় নাই। আইজ গুণীন দাদাও নাই । থাকলে অস্তর পূজা তানের ভিটায় হইত (দীন, ২০১০, পৃ. ৫১৩)।

নিঃসন্তান গুণীন শুধু ধর্মীয় পুরোহিত নন তিনি সমাজের অধিপতি। তিনি অরণ্যচারী, বৃক্ষপূজারী, সংস্কারবদ্ধ একজন পুরোহিত তিনি অন্তরে যা বিশ্বাস করেন তা মান্দাইদের বিশ্বাস করাতে বদ্ধপরিকর। কারণ ধর্মীয় মূল্যবোধ অক্ষুণ্ন রাখা তার প্রধান দায়িত্ব। এই বোধকে তিনি যথার্থভাবে সকলের মধ্যে সঞ্চারে সমর্থ হয়েছে। এবং সংস্কার মতে তিনি প্রকৃতিতেই তার আত্মা প্রথিত করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। গুণীন তার সমাজ রক্ষার্থে

[১১] অস্তর পূইজা: অস্তর মূলত অস্ত্র পূজা বলে পরিগণ্য। এখানে নিরস্ত্র মান্দাই গোষ্ঠী অরণ্যে বাঙালি জোতদারদের আসন্ন সংঘাত এড়াতে কিংবা জুলুম থেকে পরিত্রাণের লক্ষ্যে এই অস্তর পূজা আয়োজন করে। এটি হিন্দু ধর্মালম্বীদের একটি পূজা। এতে দেবী দূর্গা তাঁর দশ হাতে দশটি অস্ত্রে অসুর বধ করে থাকেন কিংবা শত্রুকে বধ করে।

ছিলেন বিচক্ষণ বুদ্ধিদীপ্ত ও কূটকৌশলী। এই তিনের সমন্বয়ে সর্বপ্রাণবাদী পূর্ণ জীবন বোধে অতৃপ্ত গুণীন নাট্যে বিশেষ মহিমা লাভে সমর্থ হয়েছে।

বনপাংশুল নাটকে অনিল কোচ ও লুৎফর মাস্টার সর্বপ্রাণবাদী উদার মানসিকতার পরিচয় বহন করে। অনিল কোচ ও সুকি প্রত্যেকে একে অপরকে ভালোবাসার বন্ধনে জড়িয়েছে। পূর্ণযৌবনা সুকি শিবকে নয় রক্তমাংসের অনিল কোচকে পতিরূপে আহ্বান করে। তবে অনিল কোচ দ্বিধান্বিত কারণ সুকি শিবের পত্নী। তাইতো সুকির প্রেমালিঙ্গন সে প্রত্যাখ্যান করে বলেঃ সুকি সনাতন ধর্ম তুমি লঙ্ঘন করতে চাও নেশার ঘোরে (দীন, ২০১০, পৃ. ৪৩১)। অনিলের সত্যিকার মোহ, ভালবাসা ও আবেগ আছে সুকির প্রতি। কিন্তু গুণীনের একান্ত শিষ্য অনিল সর্বপ্রাণবাদী গুণীনের সকল সংস্কারকে আরাধ্য হিসাবে জ্ঞান করে। কারণ অনিলের প্রগাঢ় বিশ্বাস গুণীনের উপর। তাই শিবের যে পত্নী তাকে স্পর্শের দুঃসাহস তার নেই। তবে সুকি ও অনিলের ভালবাসা পূর্ণতর হয় বাঙালির নৃশংস ও অমানুষিক মান্দাই অরণ্যে বিভীষিকাময় গুম, খুন ও ধর্ষণ ও অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে। কারণ বাঙালিদের নির্যাতনে অজস্র নারীদের সঙ্গে ধর্ষিত হয় সুকি।পরিশেষে ধর্ষিত সুকি অনাগত ভ্রুণের অস্তিত্ব টের পায়, এতেও মুক্তি ঘটে না সুকির কারণ বাঙালির ঔরসজাত সন্তান সুকির গর্ভে।

সুকির জীবনের দ্বারপ্রান্তে ঘোর বিপর্যয়। তারপরও সুকি তীব্র মাতৃত্বের টানে অনাগত সন্তানের প্রত্যাশায় বলে: একি করলা ভগবান । কিন্তু আমি মরমুনা না । না । আমি বাঁচুম (দীন, ২০১০, পৃ. ৫১৮)। কিশোরী সুকিকে সনাতন ধর্মের আবদ্ধ গন্ডীর মধ্যে পূর্ণযৌবনাবতী হতে হয়। মান্দাইগণের নানা পালা পার্বণের দরা প্রস্তুতকারীনি সুকি, যার পবিত্র হাতে সকল উৎসবের সম্পাদনা হতো। আজ সে ধর্ষিত , অপবিত্র বলে মান্দাই জনগোষ্ঠীর উৎসব, আনন্দ, সকল কিছুতে ধোঁয়া কুন্ডুলি পাকিয়ে উঠছে। নিরানন্দ, নিশ্চুপ শুনশান নিরবতায় বনপাংশুলগণ। শেষতক বাঙালী কর্তৃক ধর্ষিতা সুকিকে গর্ভের সন্তান সমেত অনিল গ্রহণ করে বলেঃ আমি তোমার উদরে যে বাড়তাছে তারে আমার সন্তান গণ্য করি। ওই অমানুষের বাচ্চাগরে সাধ্য কি আমার সুকির পুণ্যি হরণ করে। গুণীন দাদার চিহ্ন লও সুকি। খড়গ লাঠি তীর ধনুক যা আছে। আইজ চান্দের কত তারিখ জানো। অনিল সহাস্যে বলে। আইজ বৈশাখী পূর্ণিমা। ও এই যে একদিন যে মালা তোমার নিগা গাঁথছিলাম। বলে সুকির গলায় পরিয়ে দেয়। সে মালা। সঙ্গে সঙ্গে অবিশ্বাস্য। বউ কথা কও পাখি ডাকে (দীন, ২০১০, পৃ. ৫২১)।

সুকির প্রতি অনিলের ভালোবাসা ছিল পূর্ণিমা রাতের চৈতালী হাওয়ার মতো, এ যেন চাঁদনী রাতে টুপটাপ মহুয়া ফুলের দোলায়িত সুবাতাস, গজারি বনের ছায়ায় সুশীতল ছায়া। চাঁদের আলোয় সুকির হাসি বনময় প্রতিধ্বনিত হয়। উচ্ছসিত ও অনাবিল আনন্দের জোৎস্না ফোঁটে। অনিলের মধ্যে ভালোবাসার যে উত্তাপ তা এভাবেই

আবেগময় উচ্ছাসে নিবেদন করে সুকিকে। অনিল বিশুদ্ধ শিল্প বোধের একজন প্রদর্শক হিসাবে নাট্যে উপস্থিত হয়েছে। অন্যদিকে লুৎফর মাস্টারের মধ্যে প্রথমে একটি সুকোমল হৃদয়ের উপস্থিতি লক্ষ্যণীয়। মান্দাই নারী জ্যোৎস্নার প্রতি ছিল তার অগাধ ভালোবাসা। কিন্তু তাকে সে তার স্ত্রী রূপে গ্রহণে সমর্থ হননি বলে আর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়নি। কিন্তু লুৎফর মাস্টার বাঙালি-মান্দাইদের সংঘর্ষে আগুনে পুড়িয়ে বিলীন হয়ে যাওয়া সোনামুখিকে আশ্রয় প্রদান করে। সোনামুখিকে যখন সবাই বন মধ্যে অকল্যাণকর, অপয়া বলছে তখন দৃঢ়চিত্তে তার সকল দায়িত্ব গ্রহণ করে মানবিকতার আলোকবর্তিকা হয়ে উদ্ভাসিত হয় লুৎফর মাস্টার। শুধু মানবিক মানুষ নন তিনি,তার বাঁশির গভীর সুরে ধ্বণিত হয় মান্দাই সম্প্রদায়ের বহমান জীবনের শোক-দুঃখ গাঁথা। যেখানে তার নিজের জীবনের গহীনের বেদনার সুর বেজে উঠে করুণ আবেগে। লুৎফর মাস্টার সদা অন্তপ্রাণ, একজন সাদা মনের মানুষ। ব্যক্তি জীবনের নানা ঘাত প্রতিঘাত মোকাবেলা করে মান্দাই জনগোষ্ঠীর সঙ্গে জীবন মিলিয়েছে। অরণ্যচারী মান্দাইদের বিভিন্ন ঘাত -অপঘাত থেকে উদ্ধারে তৎপর ছিলেন। তাদের অন্তরের হাহাকার প্রতিনিয়ত তাকে দ্বগ্ধ করে। লুৎফর মাস্টারে দাদী মান্দাই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল বলে তাকে বাঙালী না মান্দাই এই প্রশ্নে বারংবার বিব্রত করা হয়, এ প্রসঙ্গে লুৎফর মাস্টার বলেঃ আমার দাদী ছিলেন মান্দাই নারী। দুই দাদী ছিল আর দাদা খুব অত্যাচারী জোতদার ছিল। জোর করে দাদীরে ঘরে তুলল বিয়া কলমা ছাড়াই। তারপর আমার বাপের জন্ম হল। তারপর কলমা হল। এই জন্য বাঙালিরা খেপলে বলে আমার জন্মের ঠিক নাই (দীন, ২০১০, পৃ. ৫০৬)।

লুৎফর চরিত্রের সঙ্গে মান্দাই সম্প্রদায়ের আত্মিক সংযোগ তৈরি হয়। তিনি মান্দাইদের সঙ্গে নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ থেকে সর্বোত্তভাবে তাদের বিষয়ে সচেষ্ট থেকেছে। অন্যদিকে ফরেস্টার হাসান চরিত্রে পরিলক্ষিত হয় ভিন্ন ধারার চারিত্রিক চিত্রণ। ফরেস্টার হাসান অরণ্যে এসে নারী ও মদের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকে। পরর্বতীতে লুৎফর মাস্টারের আত্মত্যাগ তাকে মান্দাইদের প্রতি সমব্যাথি করে তোলে। ফলশ্রুতিতে দুইজন মিলে মান্দাইদের যে কোন পারিবারিক-সামাজিক ব্যক্তিগত কিংবা পারিপার্শ্বিক বিষয়ে আরও সুদৃঢ় ভূমিকা পালনে সমর্থ হন। তাইতো লুৎফর মাস্টারের প্রতি প্রবল ভালোবাসা আর আবেগে ফরেস্টার হাসান বদলি জনিত কারণে চাকরি স্থল ত্যাগের সময় তার চোখ জলে ভিজে যায়। ফরেস্টার হাসান–লুৎফর মাস্টারের আসন্ন বিবাহের শুভেচ্ছা স্বরূপ সোনামুখীর জন্য দুটো সোনার বালা উপহার প্রদান করে। শুধু তা নয় তিনি ধর্ষিত সুকির বেদনায় ব্যথিত হয়ে অনিলকে জমি প্রদান করে সুকিকে নিয়ে সুস্থ ও সুখী জীবনের আশীর্বাদ স্বরূপ। তাছাড়াও বাঙালি জোতদারদের অমানুষিক অত্যাচারে বিক্ষুব্ধ ফরেস্টার হাসান,লুৎফর মাস্টারকে সবিনয়ে বলেঃ মানুষের এত ক্ষতি দুঃখ কষ্ট এত

সর্বনাশ যেন আর না দেখি মাস্টার (দীন, ২০১০, পৃ. ৫২২)। বনপাংশুল নাটকের বিলুপ্ত প্রায় অরণ্যচারী মান্দাই সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বিষয়সমূহ ধৃত হয় তা হলোঃ

১. কৃর্ত্যাচার ও মীথের প্রবল বিশ্বাস।

২. হৃদয়ের গহীনে প্রবলতর আর্তনাদ।

৩. প্রতিরোধ ও প্রতিবাদের প্রবল স্পৃহা।

অন্যদিকে বাঙালি সম্প্রদায়ের সঙ্গে যে বিষয় সমূহে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়ঃ

১. মান্দাই সম্প্রদায়ের ভূমি উচ্ছেদের ষড়যন্ত্র।

২. জোর-জুলুম।

৩. নারীদের প্রতি অবমাননা।

৪. পুরুষদের উপর অমানুষিক অত্যাচার।

মনস্তাত্তিক বিকাশ মূলত মানুষের জন্মলগ্ন কাল থেকে আমৃত্যু জ্ঞান,মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক সামাজিক ক্ষমতার বিকাশকেই বোঝায়। পরিবেশ পরিস্থিতি অনুযায়ী মানুষের মনন, হৃদয় সুগঠিত হতে থাকে অর্থাৎ জন্মলগ্ন সময় থেকে মানুষ যে পরিবেশে বেড়ে ওঠে সে সেই পরিবেশকেই ধারণ করে চিন্তা চেতনায়। সেটি ইতিবাচক হলে একটি সমাজ কিংবা রাষ্ট্র স্বাভাবিক জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়, নেতিবাচক প্রভাবে সমাজ বা রাষ্ট্র বিপন্ন হয়ে পড়ে।

বনপাংশুল নাট্যে বাংলাদেশের একটি অঞ্চলের নির্দিষ্ট মান্দাই গোষ্ঠীর জীবনে কিভাবে শাসক ও শোষিতের কারণে বিপর্যস্ত হয়ে উঠেছে তা চরিত্র সমূহের আধারে নির্ণিত হয়েছে।

মূলত বনপাংশুল নাটকের সামগ্রিক চরিত্রের যে বিপন্নতার চিত্র আভাসিত হয়েছে তা মূলত বাঙালির চতুরতা, চাতুর্যতার কারণেই সংঘটিত হয়েছে। বাঙালিরা নানা রকম পন্থা অবলম্বনপূর্বক সহজ সরল মান্দাই গোষ্ঠীকে নিঃস্ব করে তোলে । কখনো সেটা পারস্পরিক দ্বন্দ সংঘাতে লিপ্ত কিংবা মদ, টাকা প্রভৃতির প্রলোভনের মাধ্যমে। মান্দাই জনগোষ্ঠী প্রকৃগিতভাবেই সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপনে অভ্যস্ত। তাদের সহজিয়া জীবন তাদেরকে নানা ফাঁদে প্রলোভনের জালে ফেলে নিষ্পেষিত হতে বাধ্য করে। মান্দাইগনের ধর্মান্ধতা বলা যায় নিগূঢ় ধর্মবিশ্বাস নাট্যে শিব–সুকির বিষয় সুকিকে তিক্ততর অভিজ্ঞতার দিকে ধাবিত করে। প্রকৃতপক্ষে সত্য–মিথ্যার আড়ালে মান্দাই জীবনে নিত্যই নেমে আসে সামাজিক সংঘাত। যার ফলশ্রুতিতে একের পর এক অপঘাত মান্দাই জীবনে ঝড় জলোচ্ছাসের মতো আছড়ে পড়ে। অবিরত পীড়ন, উচ্ছেদ মান্দাই নারী পুরুষদের মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে। এতে সুকি হয়ে পড়ে ক্রুদ্ধ, যার ফলে সে আত্মঘাতী হবার সিদ্ধান্ত নিতে উদ্যত হয়। নৃপেন চরিত্র চলমান জীবনে মদের

ফাঁদে জড়িয়ে বাস্তুভিটা হারিয়ে বিষপানে আত্মহত্যা করে। রাজেন্দ্র চরিত্রটি গুপ্তধন লাভের আশায় ভুল পথে পা বাড়িয়ে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। এছাড়াও মঙ্গলি, সোনামুখী, লুৎফর মাস্টার প্রভৃতি চরিত্রের নানান সংকট যুদ্ধের দামামা, সংর্ঘষ, আগুন, সম্পদ লুণ্ঠনের পরিকল্পনা, আন্তঃকোন্দল মান্দাই জনগোষ্ঠীকে নিশ্চিহ্ন করে। তবুও সুকির কোল আলো করে মান্দাই অরণ্যে আসছে আরেক বনপাংশুল। নতুন আশার আলো জ্বালিয়ে-বিজয়ের নিশান হাতে নিয়ে, এখানেই গড়ে উঠবে তার নিশ্চিত আবাস। এ বিষয়ে ড. লুৎফর রহমান বলেন সুকির গর্ভে বাঙালি ধর্ষকের ভ্রূন বাড়তে থাকে – সে আরেক বনপাংশুল।

৪. উপসংহার

আলোচ্য গবেষণা প্রবন্ধটি একটি বিলুপ্তি জনগোষ্ঠীর জীবনাচার এবং তাদের প্রতি জোর জুলুমের ফলে কিভাবে এই জনগোষ্ঠী সমূহ ধ্বংসের দিকে নিপতিত হলো তা পাঠক চিত্তে প্রথিত করার সম্যক প্রয়াশ বলা যায়। নাট্যকার সেলিম আল দীন জনগোষ্ঠীর খুব কাছাকাছি অবস্থান করে এবং তাদের প্রাত্যহিক জীবনে নিজেকে সম্পৃক্ত করে উক্ত নাটকটি রচনা সম্পূর্ণ করেছেন। এই নাট্যে নাট্যকার বিবৃত করেছে বাঙালি জোতদারদের পেশী শক্তির কাছে পরাজিত মান্দাই জনগোষ্ঠীর জীবনকথা।

বনপাংশুল নাট্য চরিত্র সমূহের মধ্যে চরম নৈরাশ্য, হতাশা ও মহাজনদের নিকট পরাজয়ের বিষয়টি মনন ও হৃদয়ের প্রতিফলিত হয়। মান্দাইদের মধ্যে হাহাকারের চিত্র ফুটে উঠে গ্রাম প্রধান গুণীনের মৃত্যু, রাজেন্দ্রের ভিটেবাড়ী উচ্ছেদ মধ্যে দিয়ে নাটকের সর্বত্র ধ্বনিত হয় সহায় সম্বলহীন মান্দাইদের চিৎকার, আর্তনাদ, দৌড়ে পালাবার প্রানান্তকর চেষ্টা। মান্দাইদের আবাসস্থল যেন প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখা কেবলই নিঃশেষ হবার অপেক্ষায়। বনপাংশুল নাটকে সেলিম আল দীন মান্দাই সম্প্রদায়ের জীবনের দুটো দিক তুলে ধরেছেন প্রথমত মান্দাইগণ স্বতঃস্ফূর্ত জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিল, দ্বিতীয়ত বাঙালি সম্প্রদায়ের হীনমন,লোভ, পেশি শক্তি এই সম্প্রদায়কে করেছে পরাস্ত। যার ফলশ্রুতিতে মান্দাই অরণ্যে শান্তির ছায়ায় বিষাদের সুর। তারা আজ গৃহহীন সন্তান কিংবা স্বামী হারানোর শোকে মূহ্যমান। মান্দাইগণ বাস্তুভিটাহীন দিকশূণ্য এক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করেছে। যাদের হৃদয়ের গহীনের ক্ষরণ কিংবা আত্মবিলাপ ধ্বনিত হচ্ছে সুনশান মান্দাই অরণ্যের বাঁকে বাঁকে। এই বিষয়টি নাট্যকার সেলিম আল দীন বনপাংশুল নাটকে সূচারুরূপে সন্নিবেশিত করতে সর্মথ হয়েছে এ কথাটি স্বীকার্য।

তথ্যসূত্র

সেন, অরুণ (২০০০), *সেলিম আল দীন নাট্যকারের স্বদেশ ও সমগ্র*, দুই বাংলার থিয়েটার প্রকাশন, বগুড়া, বাংলাদেশ।

রহমান, লুৎফর (২০১২), *বাংলা নাটক ও সেলিম আল দীনের নাটক*, নান্দনিক প্রকাশ, ঢাকা,বাংলাদেশ।

রহমান, লুৎফর (২০০৯), *কালের ভাস্কর সেলিম আল দীন*, রোদেলা প্রকাশনী, ১১/১, বাংলা বাজার ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ।

দীন, সেলিম আল (২০১০), *বনপাংশুল, রচনা সমগ্র-৫*, মাওলা ব্রাদার্স, ৩৯,বাংলাবাজার, ঢাকা, বাংলাদেশ।

রুমন, শাহাদৎ (২০২৩), *সেলিম আল দীনের নাটকে শ্রমজীবী মানুষ ও সংস্কৃতি*, পেন্সিল পাবরিকেশনস, ঢাকা, বাংলাদেশ।